# ।। পথের শেষ কোথায় ।।

যে কোন কথাসাহিত্য বস্তুত সৃষ্টির সৃষ্টি । এই পৃথিবী তার চতুর্দিকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে নিত্য নতুন সৃষ্টির গতিতে এগিয়ে চলেছে। মানুষ, তার অস্তিত্ব সমাজ, ইতিহাস, আকাশ-মাটি-জল পরিব্যপ্ত অসামান্য প্রকৃতি পরিবেশ এক অমোঘ বিধানে, প্রবলতম বেগ-প্রতিবেগে নিত্য নতুন সৃষ্টির ধর্মে প্রাণবন্ত, প্রাগ্রসর। একজন সচেতন প্রতিভাবান লেখকের কলমে এই সৃষ্টিই আর এক সৃষ্টিতে ধন্য হয়ে ওঠে। লেখক নতুন জগত, মানুষ, সমাজের কথার সৃজনে হন বিভোর, গভীর-নিমগ্ন নব-ভাষ্যকার। এমন লেখকের হাতে এক একটি রচনা এই বিচিত্র পৃথিবীর অস্তিত্বেরই যেন বা খন্ড খন্ড অংশের নির্যাস হয়ে ওঠে। স্বভাবী পাঠক বাইরের জগত থেকে আর এক নতুন জগতে প্রবেশ করেন। এই নতুন জগত পরিচিত বিশেষকে দেখায় নির্বিশেষ করে।

একাধিক উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ এই বিশেষকে নির্বিশেষ করে দেখিয়েছেন। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের চোখে রবীন্দ্রনাথ অম্লান আলোকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন আমাদের পরিচয়-আমাদের জাতির আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের, আমাদের সংস্কৃতি ও সাধনার। তিনি এই বিশেষ দেশের শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতিকে, ইতিহাস-ধর্ম-মানুষ ও কালকে গ্রহণ করে অতিক্রমণে বিস্ময়কর শিল্পী হয়েছেন উপন্যাসে। উপন্যাসে নিত্য নতুন বিষয় গ্রহণ, বিষয়ানুগ মানুষকে যথাযথ চিত্রণের মধ্যদিয়ে তিনি শিল্পীর জগতে হয়েছেন সর্বভারতীয়। আর এই সর্বভারতীয়ত্ব জাতিকতা থেকে বৃহৎ জাত্যাভিমানে সাবলীল উত্তরণ-সমস্তই সম্ভব হয়েছে তাঁর স্ব-কালের কারণেই। যে কোন একজন সচেতন শিল্প-প্রাণ মানুষকে গড়ে তোলে তাঁর কাল। কাল এখানে সীমা এবং অসীম-দুই অর্থেই গ্রহণীয়।

মলাটের বুকে অথবা প্রচ্ছদে কিংবা রচনায় লেখকেরও আগে 'আমি' থাকি। সর্বক্ষেত্রেই (বস্তু বা ভাব) ঘটে বলে আমার প্রথম পরিচয় সর্বনামেই ব্যক্ত করি। আসলে অন্যের কাছে আমি কখনই সর্বনামে আদৃত হইনা বলে, এ আমার নিতান্তই নিজস্ব, একান্ত। যদি ডাকলেই আমার সাড়া পাওয়া যেত তাহলে মাহাত্ম্যের বৈভব ধূলি নীলিমায় ব্যাপৃত হত না। আমি যথার্থ হলেই পরিচিত হই, সাড়া দিই, তোমাদের সঙ্গে সারাক্ষণ অনিয়ন্ত্রিত জগত- সায়রে অবগাহন করি। আমি তোমাদেরই একজন। কখনো প্রাত্যহিকতায়, কখনো ভিজে রৌদ্রের আঘ্রাণে, কখোনো ইতিহাস পর্যটনে, ভৌগোলিক সীমা ভেঙ্গে পারাবারে, আবার কখনো আভাসে-ইঙ্গিতে অনর্গল বকে যাই, চিত্রিত হই, ভাঙি, গড়ি, সৃষ্টি রহস্যের বর্ণালি গ্রহণ করে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। আমি এক হয়েও বহু অনন্ত। তাই তোমাতে আমাতে সবাতে আমার অভিসার। এ যেন নামকরণের আত্ম পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ উপন্যাসের নামকরণে কবিত্বের ছোঁয়া পাই। ব্যঞ্জনা বা প্রতীকতার সিঁড়ি বেয়ে উঠেও তা খুঁজে নেয় কবিত্বের অলিন্দ। ধ্রুপদী সংগীতে যেমন আরোহণ অবরোহণ, আলাপ, বিস্তার, তান-এই ক্রমিক পর্বের পরিচয় মেলে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির ভিন্ন ভিন্ন নামকরণের কবি-প্রাণ- ছোঁয়া-তে।

কাব্যশাস্ত্রীরা বলেন 'অপারে কাব্যসংহারে কবিরেকঃ প্রজাপতিঃ।' প্রজাপতি ব্রহ্মার মতোই সাহিত্যস্রষ্টা নরনারী সৃষ্টি করেন। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে বিচিত্র স্বভাব ও মেজাজের এবং প্রেম, সাংসারিক ও দেশের সমস্যা ঘিরে চরিত্রগুলি চিত্রিত। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রমণী চিত্রপটের বৃহৎ চিত্রশালার মধ্যেই কবি রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে পাওয়া যায়। বাঙালী সমাজের সংকীর্ণ পরিসরে জীবনের বিচিত্রমুখী বিস্তার, ওঠা-নামা কম, তবু রবীন্দ্রনাথের 'নব নব বস্তু নির্মাণ ক্ষমা প্রজ্ঞা'- এরই মধ্যে উপাদান সংগ্রহ করেছে। সঙ্কুল বহির্ঘটনায় অভাবকে রবীন্দ্রনাথ দুভাবে পূরণ করেছেন: (ক) নিসর্গ প্রকৃতি ও ষড় ঋতু বৈচিত্র্যের রসধারায় কাহিনি ও চরিত্রকে অভিস্নাত করে। (খ) নরনারীর অপার জটিল, গূঢ় মনোজীবনের বিশ্লেষণ বা উদ্ভাসনে। বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব লেখকই- সে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর থেকে বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সমরেশ বসু কথা সাহিত্যে চরিত্রের ভাব ও ভাবনাকে স্পষ্ট করে তোলবার জন্য মারাত্মকভাবে নিসর্গ প্রকৃতির প্রসঙ্গ এনেছেন।

চরিত্রের চেতনাকে প্লাবিত করেছে-প্রভাবিত করেছে সত্য কিন্তু সে প্রভাব চরিত্রের অন্তর্গত স্বভাবের বিরুদ্ধে নয়। সে চরিত্র হঠাৎ নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করে না। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুন্ডলা যখন মুক্ত আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে নিরাসক্তভাবে বলে- 'বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে পাইলেই সুখ' কিম্বা তারাশঙ্করের নিতাই কবিয়াল যখন গ্রীষ্মের দুপুরে লাইনের বাঁকে ঠাকুরঝিকে বিন্দুর মতো দেখতে পেয়ে গেয়ে ওঠে-'আহা ভালোবেসে এই বুঝেছি তখন' সে চরিত্র চকিত করে না- তার স্বভাবটিকেই স্পষ্ট করে মাত্র। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির পটভূমিকায় চেনা চরিত্রগুলি হঠাৎ পুরোপুরি নতুন এক মানুষ হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে প্রকৃতি প্রেমের উন্মেষে বা বোধনে সাহায্য করেছে যেখানে, সেখানে সে শান্ত, স্নিগ্ধ, আকুল অনুভবের আবেশ সৃষ্টিকারী। প্রেমের জটিলতা কিম্বা বিরহ-বেদনাকে করেছে সেখানে তীব্র-দুঃসহ, অথবা মিলনের আকুলতায় চঞ্চল সেখানে প্রকৃতি প্রয়শ শ্রাবণ রাত্রির মত্ত মুহূর্ত। আবার কখনো অতলান্ত বিচ্ছেদের শূণ্য বাসরে মেদুর স্মৃতিবাহী নয়তো সান্ত্বনাদায়ী প্রকৃতি, বাংলাদেশের সজল-শ্যামলতায় সাধারণ-জন-জীবনের মাঝখানে ঐশ্বর্যহীন আটপৌরে কিষাণীর মতো।

নারীর স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। ঘর-বাহির, ভবন- ভুবনের উনিশ শতকীয় দ্বৈত তার মধ্যেও ছিল, কিন্তু কবি এখানে থামেন নি, তাই মেয়েদের ভূমিকার ঐ দ্বৈত চিন্তাকে তিনি তাঁর সচেতন ভাবনায় কাটিয়ে ওঠেন জীবনের শেষ পর্বে : রূপনারায়ণের কূলে জেগে ওঠার মতোই। বঙ্কিম প্রফুল্লকে পরিবার থেকে বাইরে এনে, আবার পরিবারে ফেরৎ পাঠিয়ে তারপর এক অথরিয়াল হস্তক্ষেপে এক বৃহত্তর সম্ভাবনার মধ্যে নিয়ে আসেন। রবীন্দ্রনাথ 'স্ত্রীর পত্রে' ঐ পরিবারে নারীর আপন সত্তা ও অধিকারের বিকাশ দেখতে পান নি। আসলে বঙ্কিম যে য়ুটোপিয়ায় দুলেছিলেন পরের দু-তিন দশকেই সে য়ুটোপিয়ার অবাস্তবতা প্রকট হয়ে উঠেছিল। জাতীয়তাবাদী যে রাজনীতি ঔপনিবেশিকতার ক্রিটিক হয়ে উঠেছিল, তা নারীর যে মুক্তির কথা ভাবে, সেটি আসলে আর এক বন্ধন: পরিবার, শ্রেণী, বাইরের জগতের ভিত অক্ষুন্ন রেখেই নারীকে এক মাতা ও রাজনীতির মাধ্যম ভাবা, যে রাজনীতিও পুরুষ নিয়ন্ত্রিত। তাই 'স্ত্রীর পত্র'-র মৃণাল, পুরুষের অভ্যাসের অন্ধকার থেকে 'পরিবার' নামক স্পেস থেকে মুক্তি চাইল- কোথায় ? ''আমার সম্মুখে আজ নীল সমুদ্র, আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ''-অর্থাৎ উন্মুক্ত প্রকৃতিতে। সমাজে নয় কিন্তু। কারণ রবীন্দ্রনাথ জানতেন ১৯১৪-য় ঐ সমাজ নেই, বঙ্কিমের আহ্বান নিতান্তই একটি শিকড়হীন য়ুটোপিয়া মাত্র। ঐ সময়েই রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' ও 'চতুরঙ্গ'। ঘরে-বাইরের দ্বৈত তখনও রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ ছাড়তে পারেন নি। 'চতুরঙ্গ'-র দামিনী পুরুষ জগৎ-কে অস্বীকার করতে চায়। এই প্রথম একটি নারী চরিত্র দেখা গেল যার স্বাধীনতাবোধে শরীরও অন্তর্ভূক্ত: শচীশ দামিনীকে ভয় পায়। শরীর ও মন মিলিয়ে পূর্ণজীবন দামিনী-শরীরের যন্ত্রনাতেই সে আর এক ইতিহাসহীন অসীমের অনুসন্ধানী, বলা ভালো ঔপনিবেশিক স্পেস থেকে মুক্তির যন্ত্রণায় অন্ধকারের শূন্যতায় লগ্ন হতে চাওয়া শচীশের পদাঘাতের অসুখ বক্ষে ধারণ করে। নারীর এই শরীরী মুক্তির কথা রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে বারবার বলতে চেয়েছেন-কিন্তু এই বলাতে রয়েছে ছবির ভাষা, কাব্যের ছন্দযতি। যে সমুদ্রের সামনে মৃণাল দাঁড়ায়, দামিনী নিজেই সেই সমুদ্র। 'চার অধ্যায়'-এ এলা প্রেমের তীব্রতায় কানাগলির ইতিহাস পেরিয়ে যেতে চায়। এলা সেই তীব্র প্যাশনের ভালোবাসায় মরতে চায়। এ ভালোবাসা নারীর স্বাধীন স্পেস। এই স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা যেমন সমাজবদ্ধ কবির অভিক্ষেপ তেমনি এই আকাশেই ইচ্ছের ভাষা, উদ্দেশ্য, বন্ধমুক্তি বলাকা হয়ে কাব্যাকাশে পাড়ি দিয়েছে।

একটা উপন্যাসের বিষয় নির্মিতির সঙ্গে সঙ্গে যখন চরিত্র সৃজন তারই অনুসঙ্গে অলংকার, প্রতীক এবং সিনটেক্সের অথবা সংলাপের বহুস্বরিক অভিযোজন লক্ষ করা যায় তখন সহজেই অনুমেয় হয় এই শিল্পী শুধুমাত্র আইডিয়ালিজম, সোসাইটি, সাইকোলজিক্যাল ওয়ার এগুলিকে প্রাধান্য দেননি, সেখানে কবিত্বের আয়োজন ঘটেছে পরতে পরতে। এই নতুনত্বের অথবা স্বাতন্ত্র্যের অভিমুখটি রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসকে 'সম্ভাব্যতা'য় সূত্রে সাম্প্রতিক করে তুলেছে। তাই এই ২০০৭-এও যেখানে অর্থনীতি ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদকে সামনে রেখে বিশ্বের প্রায় সমস্ত দরজা গুলোকে বাজারে মুক্ত করে দিয়েছে, সেখানে মানব চরিত্রের মনস্তত্ত্ব আরও বেশি বস্তুতান্ত্রিক অথবা চাহিদার উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে।

এই বাজারের প্রভাবে চরিত্র সেলফ্-সেন্টারড্, গন্ডিবদ্ধ-তা, একান্তই নিজের ব্যক্তি জীবনের এরিয়াকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ছুটে চলা মানুষগুলো ক্লান্ত হয়, হাঁপিয়ে ওঠে, কিন্তু পুঁজির নিয়মানুসারে তারা আবার নির্দিষ্ট বলয়ের মাধ্যাকর্ষণে সাম্যাবস্থায় অবস্থান করে। এখানেই রবীন্দ্র-উপন্যাসেই নির্ঝরিণী মনকে ভেজায়, চরিত্রগুলি এক অসম্ভব সূক্ষ্ম টানে ফেলে আসা অতীতের ঐশ্বর্যকে স্বীকরণে মানুষের মনের স্বপ্ন দেখাগুলোকে ফিরিয়ে আনে। রবীন্দ্র- উপন্যাসের সমাজে দেশ আছে, রাজনীতি আছে, নারীর মুক্ত মন ও শরীরের কথা আছে, ঔপনিবেশিকতার দূরূহ শাসন থেকে মুক্তির বাসনা আছে-কিন্তু এগুলি কখনো উচ্চকিত মেজাজের স্বরগ্রামে রুক্ষ, পাথুরে, বন্ধুর হয়ে ওঠেনি। শস্য শ্যামল বাংলাদেশের বুকে, নিসর্গের ছোঁয়ায়, ভাষার পেলব-ঋজুতার সংমিশ্রনে, এপিগ্রামের ঔজ্জ্বল্যে যেন এক কবি-প্রতীতির স্থানটিকে পাঠক মনে ধরিয়ে দেয়। এই শৈলী তাই সাম্প্রতিক লেখকদের কাছে আরাধ্য হয়, স্বাতন্ত্র্যে তা ভবিষ্যতের পাঠ্যও হয়ে ওঠে। কবি-কথাকারের স্বপ্ন অধ্যাসে রবীন্দ্র- উপন্যাস এখনো এবং হয়তো পরেও সাম্প্রতিকের স্থানটিকে বারবার ধরিয়ে দেয় বা দেবে।